Vol. II, Issue-I, 2022
SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

প্রাচীন ভারতের দর্শন ও সংস্কৃতি এবং নবজাগরণের মাধ্যমে তার সংস্কার

প্রতাপ চন্দ্র লাহা

সারসংক্ষেপ

নবজাগরণ হল নতুন করে জেগে ওঠা, জাগরিত সমাজের লক্ষণ হল সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তার উপর ভর করে বিজ্ঞানমনস্কভাবে সকল কিছুকে যাচাই করে নেওয়া অথবা যুক্তি তর্কের আলোকে সকল কিছুকে গ্রহণ বা বর্জন করা। সেই সঙ্গে সমতা, ন্যায়, শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, নতুনকে সাদরে গ্রহণ করে নেওয়ার ক্ষমতা সমান ভাবে সেই সমাজে বিরাজ করে। প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ বৈদিক সমাজের মোটামুটি এই রকমই সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। কিন্ত সময়ের স্রোতে সেই সমাজ ব্যবস্থার অবনতি সাধিত হয় এবং ভারতীয় সমাজ কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়। সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ এর এই অন্ধকার যুগকে তরান্বিত করে। পরবর্তী সময়ে তথা বর্তমান ভারতবর্ষে নবজাগরণের প্রদীপ হাতে একদল মনীষী সামনে আসেন। তারা কখনো রিভাইভাল মুভমেন্ট এবং কখনো রিফরমিস্ট মুভমেন্ট এর মানদন্ডকে সামনে রেখে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন, এরকমই কিছু মহামানব হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, এমডি রানাডে প্রমুখ। তবে এই ধারার এখনো বিরাম ঘটেনি বা বলা ভালো বিরাম ঘটা উচিত নয়, কারণ সময়ের সাথে সাথে সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী আর এই পুরাতনকে ফেলে নূতনকে আলিঙ্গন করার নমনীয়তা সমাজের স্বাভাবিক নয়, তার জন্য বারে বারে নবজাগরণের কান্ডারীর দরকার হবেই।

রেনেসাঁস কথাটি একটি ফ্রান্স শব্দ যার অর্থ হল Rebirth বা পুনর্জন্ম। এই পুনর্জন্ম হল চতুর্দশ থেকে ষষ্ঠদশ শতকে ইউরোপের ' the art and literature Revival under the classical model'. সাধারণভাবে এই রেনেসাঁসের অর্থ আমরা করি নবজাগরণ বা পুনর্জাগরণ এখন প্রশ্ন হল কিসের থেকে জাগরণ এবং এই সামাজিক নিদ্রার পূর্বে সংস্কৃতিক দার্শনিক তথা জ্ঞান-বিদ্যার কোন স্তরে ভারতীয় সমাজের অবস্থান ছিল তা জানা দরকার এবং তার জন্য আমাদের প্রায় 15000 BC. বছর পূর্বে অর্থাৎ বৈদিক যুগে যাওয়া দরকার। কারণ এই বেদই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা দর্শনের মাতৃস্বরূপ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম সকলই জীবন ধারার সাথে গতিময় ছিল। জাতি প্রথা সেই সমাজে তখনও আসেনি। তবে সমাজ চালানোর ক্ষেত্রে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমের কথা জানা যায়। যেখানে গুণ এবং কর্মের অর্থাৎ তাদের আগ্রহের ভিত্তিতে জনগণকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। শিক্ষা, গবেষণা, পূজার্চনা ইত্যাদির ভার ছিল ব্রাহ্মণদের উপর। রাজ্যের অন্তরবর্তী আইন ব্যবস্থা তথা রাজ্য সুরক্ষার ও রাজ্য চালনার ভার ছিল ক্ষত্রিয়দের উপর। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, পশুপালন ইত্যাদিতে যাদের প্রবৃত্তি অনুকূল ছিল তারা হলেন বৈশ্য। এবং সমাজব্যবস্থাকে নির্মল রাখতে এবং সঠিকভাবে চালানোর জন্য যে work force লাগতো তার দায়িত্ব ছিল শূদ্রদের উপর। এছাড়াও ব্যক্তি জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য চারটি আশ্রমের কথা জানা যায় যথা ব্রহ্মচর্য গারহস্থ্য বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা যতটা জানতে পারি তা হল ব্রহ্মচর্য কালে অর্থাৎ 5 থেকে 25 বছর বয়স পর্যন্ত বালকদের গুরু গৃহে থেকে শিক্ষা অর্জন করতে হতো। সেখানে কেবল স্বাস্থ্যাদির অধ্যায়নই হত না সেইসাথে গণিত, বিজ্ঞান, অস্ত্রশিক্ষা, নীতিবিদ্যা, মূল্যবোধ, জ্যোতিষবিদ্যা সহ প্রায় 18 টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। বৈদিক যুগে পুরুষ এবং নারীদের শিক্ষার সমান অধিকার ছিল, তাই আমরা বৈদিক কালে তিন প্রকারের উচ্চশিক্ষিত নারীর কথা জানতে পারি যথা- ব্রহ্মবাদিনী, মন্ত্রবিদ এবং পন্ডিত। সেই সাথে ঋক বেদের বিভিন্ন শ্লোক এটাই প্রমাণ করে যে তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের স্থান পুরুষের সমতুল্য ছিল।

প্রাচীন ভারতে চার প্রকার বিদ্যা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, যথা- ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ সম্পর্কে জ্ঞান। বার্তা বা ভারুম অর্থাৎ চাষাবাদ, ব্যবসা, চিকিৎসাদি সম্পর্কিত বিদ্যা। অন্বিক্ষা অর্থাৎ প্রমাণ, যুক্তি, তর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে সত্যে পৌঁছানোর বিদ্যা এবং দন্ড অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বিদ্যা। এই চারটি বিদ্যা জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখা কেই অন্তর্ভুক্ত করে। আধ্যাত্মিকতা তো বটেই সেই সাথে ভারতীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞান বিদ্যার প্রাচুর্যের নিদর্শন হিসাবে পরবর্তী সময়ে চরক ও সুশ্রুত এর চিকিৎসা শাস্ত্র, যোগ, আয়ুর্বেদ, astronomy, অর্থশাস্ত্র, ষড়দর্শন ইত্যাদি যা বেদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব আজও ক্ষীন হয়ে যায়নি। একই সাথে ভারতীয় নৈতিকতার দিকটিও এই সংস্কৃতি ও দর্শনের অভিন্ন অংশ। ভারতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থে 'বাসুধৈব কুটুম্বকম্' এর মত ধারণা ভারতীয় সমাজের

inclusiveness কে বর্ণনা করে সেই সাথে আরো পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অহিংসা, দয়া, দান, ধর্ম ইত্যাদির ধারণা বিশ্বকে প্রেরণা জোগায়, সেই সাথে কর্ম বাদের ধারনা ভারতীয় দর্শন তথা সংস্কৃতির মোজ্জায় অবস্থিত তা বলা চলে। যার সংক্ষিপ্ত রূপ হল এই যে প্রত্যেকেই তার বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী সে নিজেই, এখানে ঈশ্বর বা কোন অলৌকিকতার হাত নেই, তাই হয়তো ভারতীয় প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় 'যেমন কর্ম তেমন ফল' এই উক্তিটি খুবই প্রসিদ্ধ। এছাড়াও ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন তথা ধার্মিক গ্রন্থে প্রশ্ন করার রীতি ও যথাযথ তর্কের মাধ্যমে যেখানে বাদী, প্রতিবাদী একজন মধ্যস্থতাকারীর সঞ্চালনায় তর্ক করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার যে কৌশল তা এই সভ্যতার জ্ঞানের প্রতি উদারতাকে নির্দেশ করে।

এখন প্রশ্ন হল এরকম এক সমৃদ্ধ সভ্যতার অবক্ষয় হওয়ার কারণ কি? সভ্যতার বিকাশ যেমন একদিনে হওয়া সম্ভব নয় সেরকমই তার অবক্ষয়ও হঠাৎ করে ঘটেনা। এই সংস্কৃতির অবক্ষয় হতে শুরু করে সাধারণত later vedic age বা পৌরাণিক কাল থেকে। যেখানে বৈদিক সাহিত্যের মিস ইন্টারপ্রিটেশন শুরু হয় এবং বর্ণ ব্যবস্থার সূত্র ধরে গঠিত হয় জাতি প্রথার। রাজ্য জয়ের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হলে শিক্ষার অবনয়ন শুরু হয়। আর এমত অবস্থায় বহিঃ শত্রুর আক্রমণ এই অবক্ষয় গতি প্রদান করে। তারা লুণ্ঠনের সাথে সাথে শিক্ষাব্যবস্থার উপরেও আক্রমণ চালায়। আর এরকমই এক আক্রমণের শিকার হয় তৎকালীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস স্থল নালন্দা

বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর মুঘল আমল পেরিয়ে ভারতে যখন ইংরেজদের রাজত্ব শুরু হয় তখন তারা ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ইংরেজি মাধ্যমের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করে। যা সাধারণ ভারতীয় কে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি। ফলে সমাজ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। আর তাই দরকার হয় নবজাগরণের।

নবজাগরণ যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তা হল পূর্বা গ্রহ বর্জিতভাবে rational thinking. সে হিসেবে দেখতে হলে গৌতম বুদ্ধকেই ভারতের প্রথম নবজাগরণের প্রথিকৃৎ বলা চলে। তিনি বেদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে সত্যের নতুন ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেরকমভাবেই মহাবীর জৈন সমেত আরো অনেকে সময়ে সময়ে নতুন স্বাধীন চিন্তার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। তবে আধুনিক সমসাময়িক ভারতে নবজাগরণ শুরু হয় দুটি ধারাতে, একটি হলো Reformist movement এবং অপরটি হল Revival movement. Reformist বা সমাজ সংস্কারকরা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চাইতেন শুধুমাত্র rational or scientific thinking এর উপর নির্ভর করে, এতে কোন রকমের পূর্বাগ্রহের স্থান ছিলনা, এরা হলেন- ব্রহ্ম-সমাজ, সত্যশোধক সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আলীগড় movement ইত্যাদি। আর Revivalist রা চাইতেন ‘back to the root’ অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির পুরনো ঐতিহ্যকেই নবিকরণের দ্বারা সমাজের পুনর্গঠন করতে। এই মতাদর্শের সমর্থক হল

আর্য সমাজ, থিওসপিকেল সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি। তবে দুইটি ধারার লক্ষ্য যে এক ছিল, যা কিনা কুসংস্কার মুক্ত এবং সচেতন সমাজ গঠন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে নবজাগরণের সূচনা হয় ব্রাহ্মসমাজের হাত ধরে। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তার স্বতন্ত্র চিন্তা সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারকে মেনে নিতে পারেনি, বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সমাজের সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন যেমন- সতীদাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি। তবে এদের মধ্যে যে কাজটি তাকে অমর করে রেখেছে তা হলো সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ সেই সাথে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন হওয়ার কারণে তিনি হিন্দু, মুসলিম খিষ্টান ধর্মের প্রধান ধর্ম গুলিকে অধ্যায়ন করে তাদের উপর গ্রন্থ রচনা করেন এবং একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল ধর্মের সমতা-বিধানে সচেষ্ট হন। রাজা রামমোহন রায়ের পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারকরা এই ব্রাহ্মসমাজের ধারাকে নিজেদের মতন করে এগিয়ে নিয়ে যান সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে। এই একই সময়ে হেনরি ডিরোজিও দ্বারা চালিত হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট, তিনি তৎকালীন (1826) হিন্দু কলেজের একজন অধ্যাপক হওয়ার কারণে ছাত্র যুবকদের স্বাধীন চিন্তা, সমতা, কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করা, বিভিন্ন প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতন বিভিন্ন বিষয়ে উদ্দীপিত করতেন। তাই তাকে ১৮৩১ সালে কলেজ থেকে বহিঃস্কৃত করা হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাত্র ২২ বছর বয়সে তার মৃত্যু হওয়ার পর এই আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তী এক মহান সমাজ সংস্কারক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি নারী শিক্ষা এবং বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি মনে করতেন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারের প্রধানতম কারণগুলির মধ্যে একটি কারণ হলো ভারতীয় শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা, কারন সেগুলি বেশিরভাগই সংস্কৃত ভাষাতে রচিত তাই তার অর্থ উদ্ধার সাধারনের সাধ্য নয়। এর সমাধানে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার উপর জোর দেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি একটি সংস্কৃত কলেজের স্থাপনা করেন।women empowerment এর জন্য তিনি স্ত্রী শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেন আর এ বিষয়ে এক প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল co-ed School গুলিতে মেয়েদের না পাঠানোর প্রবণতা। তাই তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করেন এবং তার প্রচেষ্টায় প্রায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

এরপর 1875 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় আর্য সমাজের যার কর্ণধার ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী। তিনি বৈদিক জ্ঞানকে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ করতে চেয়েছিলে। আসলে তিনি মনে করতেন বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগে স্বাধীন ও যুক্তি পূর্ণ চিন্তনের উপর আস্থা ও বিশ্বাসের স্থান দেওয়ায় সমাজে কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে। তাই তার প্রধান বক্তব্য ছিল getting back to the Vedic life. কিন্তু একই সাথে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাচীন বৈদিক জ্ঞান এবং modern scientific education এর সংমিশ্রনেই একমাত্র সমাজের অগ্রগতি সম্ভব। তাই তিনি দয়ানন্দ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুল এর স্থাপনা করেন।

এরপর আসেন এমন এক মহাপুরুষ যার চেতনার দীপ্তি সমগ্র ভারতের যুবসমাজ তথা সাধারন নাগরিককে উৎসাহিত করেছিল তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্য। শ্রী রামকৃষ্ণ নিজে নিরক্ষর হলেও সাধনা বলে তিনি ব্রাহ্ম জ্ঞানের অধিকারী হন, এই জ্ঞানকে তিনি অতি সহজ সরল ভাষায় মানুষের কাছে উপস্থাপনা করে বেদান্ত চেতনার উন্মেষ ঘটাতেন তার এই কাজকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন তার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্ব যখন ভারতীয় সভ্যতা তথা সংস্কৃতির মহানতাকে প্রায় ভুলতে বসেছিল ঠিক তখনই 1893 সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মসভা তে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের দর্শন তথা সংস্কৃতিকে পুনরায় বিশ্বের স্মৃতিতে উদ্ভাসিত করেন। পরবর্তী সময়ে দেশে ফিরে এসে তখনকার সমাজের মানুষের দুর্দশা ও অকর্মণ্য অবস্থা দেখে তাঁর মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। যদিও তিনি আমেরিকা ইউরোপ তথা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বেদান্ত এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন তথাপি দেশে ফিরে তিনি সমাজসেবার কাজে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। তার উদ্যোগেই সে সময়ে বিভিন্ন স্কুল কলেজ এবং হাসপাতালের নির্মাণ হয়। তিনি উপলব্ধি করেন এই সময়ে ভারতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অপেক্ষা physical well being সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি মনে করতেন একটি শক্তিশালী মস্তিষ্ক কেবল শক্তিশালী শরীরেই থাকতে পারে। তাই একজন সন্ন্যাসী হয়েও তিনি আমিষ খাদ্য গ্রহণের কথা বলতেন। এছাড়াও তিনি মানুষের সেবা, সুস্থতা, শিক্ষা এবং বেদান্ত চেতনার উন্মেষের জন্য বেলুড় মঠের গঠন করেন এবং স্থাপন করেন

রামকৃষ্ণ মিশনের। তিনি ছিলেন একজন কর্মযোগী তাই বেদান্তের শিক্ষাকে তিনি কেবল জ্ঞান চর্চার পর্যায়ে না রেখে বাস্তবে তার প্রয়োগ ঘটিয়ে জাতির উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।

এরপরেও ভারতের সমাজ সংস্কার এবং দেশ গঠনের কাজে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সংগঠন সামনে আসে। যেমন মহারাষ্ট্রের প্রার্থনা সমাজ যা M. D রানাডে গঠন করেন। যাদের প্রধান চারটি উদ্দেশ্য ছিল,যথা- জাতিপ্রথার উচ্ছেদ, নারী শিক্ষা বিধবা বিবাহ, এবং বাল্যবিবাহ নিবারণ। কিন্তু যদি জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদে যদি কেউ সব থেকে বেশি সরব হন তিনি হলেন জ্যোতিবা ফুলে। তিনি তথাকথিত নিচু জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর চেষ্টা করেন। তবে যে মহান ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব জীর্ণ বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সমাজকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞানের দ্বারাই সেচন করে পুনর্জীবিত করেছিলেন তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী। এখন পর্যন্ত যতজন নবজাগরণের প্রতীককে দেখলাম তাদের মধ্যে গান্ধীজীর প্রভাব ছিল অনেক বেশি তার অহিংসার আদর্শ, যা কিনা তিনি ভারতীয় দর্শন তথা সংস্কৃতি থেকেই লাভ করেছিলেন, তা কেবল ভারতেই নয় সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। অহিংসা কেউ যে প্রতিবাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় তা গান্ধীজীর আগে হয়তো কেউ কল্পনাও করেনি। গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তায় যে সমস্ত ধারণা আমরা দেখতে পাই যেমন- গ্রাম স্বরাজ, ব্রেড লেবার, সর্বোদয়, স্বদেশী ইত্যাদি তা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকূলে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার বলা চলে। তেমনি তিনি নারী শিক্ষা, প্রকৃতির রক্ষা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখে গেছেন। তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব

এতটাই বিশাল যে বর্তমানকালেও তার আদর্শকে পাথেয় করে ভারতীয় সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

নবজাগরণের কালে আমরা যা সাধারণভাবে লক্ষ করি তাহলে শিক্ষা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, সমাজে সমতা স্থাপন, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি বিষয় সংস্কার সাধনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এবং এগুলি অবশ্যই মানবকেন্দ্রিক মুক্ত এবং স্বাধীন চিন্তার ফল, তবে বলতে হয় এই নবজাগরণের কাল এখানেই থেমে থাকেনি বা বলা ভালো থেমে থাকবেও না কারণ এই নবজাগরণ একটি গতিময় প্রক্রিয়া, যে নতুন চিন্তনের ধারা নবজাগরণের পথিকৃৎ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সব ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য এখনো সিদ্ধ হয়নি সেই সাথে সমাজের চোখের আড়ালে যাওয়া এবং নতুন বহু সোশ্যাল ইস্যু রয়েছে, যেখানে নবজাগরণ ঘটা আজও বাকি আছে। তবে সে বিষয়ে যে সভ্য সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলা বাহুল্য। সে কারণেই হয়তো আমরা deep Ecology, LGBT right, Euthanasia, right of pregnant women, personal liberty ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাজের stereotype বা বদ্ধমূল ধারণাকে অতিক্রম করার আকুতি আমরা বর্তমান সমাজে দেখতে পাই। তাই সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে নৈতিকতা এবং নবজাগরণের প্রসার যে আরো বৃদ্ধি পাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্রন্থপঞ্জি:

1.বাংলার রেনেসাঁস, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রকাশক- অবনীন্দ্রনাথ বেড়া, বাণী শিল্প, দ্বিতীয় মুদ্রণ

2.The Indian renaissance: India's rise after A Thousand Years of Decline, Sanjeev Sanyal, Penguin books India Pvt. Ltd.

3. ইতালি ও রেনেসাঁসের আলোকে বাংলা রেনেসাঁস ড: শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

4. বাংলার রেনেসাঁস, সুশোভন সরকার, প্রকাশক রেনুকা সাহা, দীপায়ন

5. Society in Ancient India, Suresh Chandra Banerji, D.K. print world Ltd

6. বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি, নিপেন্দ্র গোস্বামী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড